# শিল্পের সত

খালেদ চৌধুরী

১ : ০

থিয়েটারে আসাটা অকস্মাৎই বলা যেতে পারে। কেন না, থিয়েটারে আসব, থিয়েটার করব কোনও দিনই আমার ভাবনার মধ্যে ছিল না। আমি মূলত চিত্রশিল্প এবং সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত সংগীত। একেবারে ছেলেবেলায় আমার পাঠশালায় পড়ার দিনে একটা জিনিস দৃশ্যবস্তু হিসাবে ভীষণভাবে আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমাদের স্কুলের কাছেই একটা গ্রামে একবার নৌকা-পুজো হয়েছিল। নৌকাপুজো ব্যাপারটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এটা এক ধরনের মানত। নৌকার আকৃতিতে বিশাল উঁচু একটা কাঠামো নির্মাণ করা হতো। তার দু দিকে দুটো গলুই-এর মতো জিনিস বানানো হতো। বিরাট আকার। ছেলেবেলায় তাকিয়ে দেখতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যেত। তাতে ভূত, প্রেত, নানা অবতার আর দুর্গা প্রতিমা থেকে শুরু করে লক্ষ্মী সরস্বতী পর্যন্ত বহু দেবদেবীর মূর্তি থাকত। আর দুদিকে থাকত দুই রাখাল। এক বর্ধিষ্ণু চাষির মানত ছিল, তারই উদ্যোগে এই পুজোর শুরু। এক একটা করে মূর্তি তৈরি হয় আর উপরে বসানো হয়। আমি খবর পেয়ে গিয়ে দেখি অনেক মূর্তিই তৈরি হয়ে গেছে, জায়গা মতো বসানো হয়েছে আর কিছু মূর্তি তৈরি তখনও বাকি আছে। প্রচণ্ড কৌতূহল হল। রোজই মূর্তি গড়া দেখি আর স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। বাড়িতে বলি, স্কুলে একসট্রা ক্লাস নিচ্ছে। ব্যাপারটা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম কীভাবে মূর্তি তৈরি হচ্ছে। দুপাশে দুটো তালিকা থাকত। রোজই ওটা একবার পড়া চাই। তাতে ভূত প্রেত থেকে শুরু করে অগ্নি বরুণ ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের নাম লেখা থাকত। সমস্ত দেবদেবীর নাম আমাদের মুখস্থ হয়ে গেল। এমনকি দু দিকে দুই রাখাল বালকের নাম বলতে গিয়ে আমরা বলতামও 'রাখাল-রাখাল'। সেই মূর্তি-গড়া দেখে-দেখে একদিন বাড়িতে আমি মূর্তি বানানো শুরু করে দিলাম মাটি দিয়ে ছোট-ছোট নানা রকম মূর্তি বানিয়ে চলেছি। আমার তো কোনও ট্রেনিং ছিল না। যেমন-যেমন দেখেছি সেইভাবেই নিজে যতটা পারছিলাম চেষ্টা করছিলাম। অনেক মূর্তি বানিয়ে সারি-সারি সাজিয়ে রেখেছি। বাবা একদিন হঠাৎ যেতে-যেতে ওগুলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার ছবি-আঁকা বা কিছু গড়ার কাজে বাবা সাধারণত কোনও আপত্তি করতেন না। এমনিতে বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু এগুলোতে আপত্তি করতেন না। মূর্তিগুলো দেখে বললেন, 'এগুলো বানাবে না। এগুলো বানালে পুজো করতে

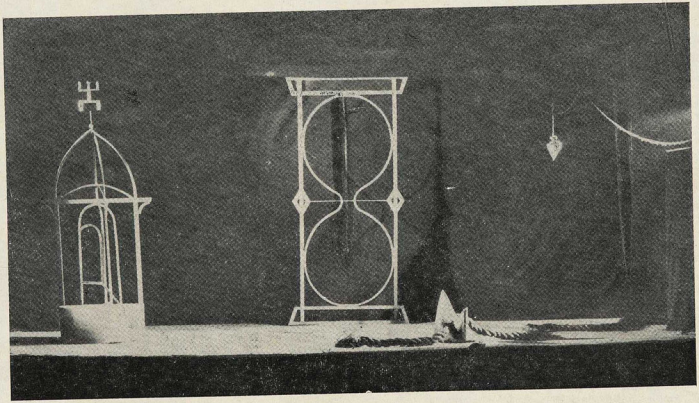

'কালের যাত্রা' ঃ খালেদ চৌধুরী কৃত মঞ্চসজ্জা।

হয়।' আমি ভাবলাম পুজো মানে তো দায়-দায়িত্বের ব্যাপার যেটা ওঁদের উপরে গিয়ে পড়বে। অতএব এগুলো বানানো উচিত নয়। সেইদিনই বন্ধ করে দিলাম। মূর্তি দেখে মূর্তি গড়া—এটাই আমার প্রথম ইনস্পিরেশন। অর্থাৎ ভিসুয়াল একটা জিনিসকে অনুকরণ করা। চোখের সামনে কীভাবে একটা মূর্তি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া স্কুলের ড্রইং ক্লাসে আমি বরাবরই এক নম্বর! মাস্টারের চেয়েও ভাল আঁকতে পারতাম। অন্যদের খাতাতেও এঁকে দিতাম। দেখা গেল, যে ছেলেটি আঁকতে আদৌ জানে না, সেও ভাল নম্বর পাচ্ছে। একদিন পরপর তিনটে খাতা দেখে মাস্টারের কেমন সন্দেহ হল। যে কোনদিনই আঁকতে পারে না, তার খাতাতেই সবচেয়ে ভাল আঁকা। আসলে পরপর এত এঁকেছি যে ওর খাতার ছবিটাই ভাল হয়ে গেছে। আমার খাতাটা আর না দেখেই আমাকে ডেকে কান ধরে দুটো চড় লাগালেন। বললেন, 'আর কখখনো কারও খাতায় আঁকবে না।' আমাকে জিজ্ঞাসাও করলেন না যে আমিই এঁকেছি কি না। এরপরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অন্যরকমের সমস্যা দেখা দিল আমার জীবনে। ফলে স্কুলের পরে আঁকার ব্যাপারটা আমার জীবন থেকে চলে গেল।

পরবর্তীকালে কীভাবে আবার এটা ফিরে এল তাই বলি। ১৯৩৮ সাল। তখন আমি বেশ বড় হয়ে গেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। ছদ্মনামে আছি। তারপরে যুদ্ধ লাগল। এইসময় যুদ্ধের বাজারে সবাই টুকটাক কিছু কাজ করছে। আমিও মিলিটারির সাইন-পেন্টিং-এর কনট্রাক্ট নিয়ে ফেললাম। নানারকম ট্রাফিক-সাইন এঁকে দেওয়া, ট্যাংক, প্লেন রঙ করে দেওয়া, ক্যামোফ্লাজ কালার করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ। লোক লাগিয়ে কাজ করতাম। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল। লেটারিং-এর ক্ষেত্রে তাই আমার সুবিধা হল। আমি নিজে সাইন পেন্টার না হয়েও কাজটা যারা করে তাদের ডেকে বুঝিয়ে দিতাম কীভাবে কাজটা করতে হবে—কী জাতীয় টাইপ আঁকতে হবে। এইভাবে কিছু লোকের ধারণা হয়ে গেল যে আমি আর্টিস্ট। মফস্বল শহর তো!

এই সময় আমার এক মামারবাড়িতে আমি প্রায়ই যেতাম। এক ভদ্রলোককে আসতে দেখতাম ওখানে। নাম বিনোদবন্ধু দাস। উনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। আমার মামাতো ভাইকে নানা কাগজ-পত্র দিতেন। 'জনযুদ্ধ' বা ওই জাতীয় কাগজ। ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি সবাই কিন্তু আগে কংগ্রেসি ছিলেন। সব খদ্দর পরতেন। পরে দু-একজন ছাড়া অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই যে দলে-দলে সবাই কমিউনিস্ট দলে যোগ দিচ্ছেন এটা আমরা জানতাম মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে আমার রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ ছিল না, এখনও যেমন নেই। তবে খোঁজ-খবর সবই নিই। যাইহোক ওই বিনোদবন্ধু দাস একদিন আমাকে স্তালিনের একটা বড় ছবি এঁকে দিতে অনুরোধ করলেন। ছোট ভাইবোনেরা রয়েছে। আগে ওদেরকে ছবি আঁকা নিয়ে হয়ত বয়সজনিত বড়-বড় কথা কিছু বলেছি। তাই ভদ্রলোককে 'না' বলতেও

পারছি না। তাহলে তো ভাই-বোনেদের সামনে আর 'প্রেস্টিজ' থাকে না। ভদ্রলোককে বললাম, 'হ্যাঁ' নিশ্চয়ই এঁকে দেব।' দরজা-টরজা বন্ধ করে বড় একটা কাগজে চারকোল দিয়ে ছবিটা এঁকে ফেললাম। ভদ্রলোক ছবিটা নিয়ে চলেও গেলেন। পরে একদিন দুর্ভিক্ষের সময়ে এক প্রচার সভায় উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন চাঁদা তোলা চলছে, সমস্ত লোককে যে যা পারে তাই নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছিল। সেই মিটিং-এ গিয়ে শেষ বেঞ্চে বসেছি। দূর থেকে অনেকগুলো পোর্ট্রেট দেখতে পেলাম। তার মধ্যে ছোট্ট সাইজের একটা স্তালিনের ছবিও ছিল। একজন নেতা উঠে এসে প্রথমে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়ে তারপরে ছবিগুলোকে দেখিয়ে বললেন, 'এই স্তালিনের ছবি দেখে আপনাদের মনে হতে পারে যে এটা কলকাতার কোনও আর্টিস্ট-এর আঁকা। কিন্তু ছবিটা এঁকেছে আমাদেরই এখানকার একজন ছেলে।' বলে উনি আমার নাম ঘোষণা করলেন। শুনে তো আমার দারুণ রোমাঞ্চ হল। কিন্তু ভাবছি : আমি তো বড় ছবি এঁকেছি, এত ছোট ছবি কী করে আমার হবে? আসলে পারস্পেকটিভের কোনও ধারণা পর্যন্ত আমার ছিল না। বড় ছবিকে দূর থেকে দেখলে ছোট দেখানোর ব্যাপারটাই বুঝিনি। সেই সভায় তারপর সুন্দর চেহারার দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিলেন। ওঁরা ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরি ও শান্তা সেন। এই জাতীয় গান শোনার অভিজ্ঞতা সেই আমার প্রথম। অর্থাৎ শিল্প শুধু বিনোদন নয়, শিল্প যে একটা উদ্দেশ্যকে সফল করাতে পারে, গান-ছবি ইত্যাদি যে বিশেষ উদ্দেশ্যে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে—এরকম একটা উপলব্ধি হল। তখন বিশ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হল। উনি খুব উৎসাহ দিলেন। কলকাতার লোকের প্রশংসা পেয়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করলাম। এই সময় থেকেই লাগাতার ছবি আঁকা শুরু হয়ে গেল। ওঁরা থিম দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন দুর্ভিক্ষের অবস্থা, মজুতদারি কাকে বলে ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ তো আমাদের ওদিকে ছিল না। তাই অনেক কিছুই জেনে বুঝে নিচ্ছিলাম। প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। রেডিও, কাগজের মাধ্যমে যেটুকু জানতে পারছি। জয়নুল আবেদিন ও চিত্তপ্রসাদের ছবি ও সুনীল জানার ফোটোগ্রাফ দেখছি। এইসব দেখেশুনেই ভিতরে একটা আর্তি জন্মাল—একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু আর্টের শিক্ষা তো আমি কোনও দিনই কারও কাছে পাইনি। তবু ওঁরা ধরেই নিলেন যে আমি সব জানি। আমিও আমার স্কুলে চিন্তায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মজুতদার আঁকতে গিয়ে অদ্ভুত একটা নখটখওয়ালা হাত ধানের আঁটি জাপটে ধরে আছে—এই সব ছবিতে চলে আসত। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য ছিল লোককে বোঝানো তাই প্রয়োজন থেকেই শিক্ষালাভ করতে থাকলাম। রঙ-টঙ ও হাতের কাছে যা পেতাম তাই ব্যবহার করতাম। থিম অনুযায়ী 'সিরিজ অব পিকচার্স' এঁকে যাচ্ছি তখন। নানা জায়গায় তার প্রদর্শনী চলছে। 'ফুড ক্রাইসিস' নিয়ে এমন একটা সিরিজ শিলঙে দেখানো হল। একটা সময়ে সুন্দরী

মোহন দাশের নাতনির বাড়িতে বসে এ ধরনের সিরিজের ছবি এঁকেছি। তবে রাজনীতির বা শিল্পের ধারণা আমার তখন পরিষ্কার ছিল না। তখন হেমন্ত দাশ, রাধিকা বল্লভ রায়চৌধুরি প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। রাধিকাবল্লভ লোকসঙ্গীত গায়ক রণেন রায়চৌধুরীর দাদা। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরির ছাত্র। শিক্ষিত শিল্পী। ওঁরা যখন আমার ছবি দেখে ভাল বলতেন, তখন মনে হতো 'না, ছবি বোধহয় জাতে উঠছে।' প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘের এক প্রদর্শনীতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আঁকা কিছু ছবি দেখেন। উনিও অনেক প্রশংসা করলেন। অজিত সিংহ ছিলেন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের পাশ করা শিল্পী। এক প্রদর্শনীতে আমার ছবিগুলি উনি সাজিয়ে দেন। তিনি বললেন, 'তোমার কলকাতায় যাওয়া উচিত।' আমার ছবির নানা গুটিও উনি ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু কলকাতায় আসতে হলে টাকা চাই। ফার্নিচার ব্যবসায়ী এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে ওঁর ফার্নিচারের ডিজাইনের একটি অ্যালবাম বানিয়ে দিলে আমাকে একশ টাকা দেবেন। উনি আমাকে পাঁচ-দশ টাকা হিসাবে দিয়ে যান আর আমিও সেটা খরচ করে ফেলি। শেষে এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে আমার কলকাতায় যাবার ব্যাপারটা শুনে বাকি চৌষট্টি টাকা আমাকে দিয়ে দিলেন। ওই পুঁজি নিয়ে কলকাতা চলে এলাম আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার বাসনায়। সেটা ১৯৪৪ সাল। অজিত সিংহ আমাকে নিয়ে গেলেন জয়নুল আবেদিনের কাছে। জয়নুল আবেদিন আমার অবস্থার কথা সব শুনে বললেন, 'থাক, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না।' আমি ভাবলাম বোধহয় টাকা দিতে পারব না কিংবা আঁকার মান ওঁকে সন্তুষ্ট করেনি এটাই কারণ। উনি কিন্তু প্রায়ই আমাকে প্রচুর কাজ দিতেন। ওঁর কাছে যে শিখছিলাম তাও নয়। উনি শুধু এটা-ওটা দিয়ে বলতেন, 'করে দাও তো।' পুজো সংখ্যায় ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি সেইসময় প্রচুর করেছি।

এরপরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। দেশভাগ হয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে রোজই যাতায়াত করছি—কাজও করে চলেছি। গোলাম কুদ্দুস দাঙ্গার পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারি কিনা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, রিলিফের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি সাংস্কৃতিক কাজ কিছু করতে পারি। নাসিরুদ্দিন রোডে ব্যারিস্টার লতিফের বাড়িতে কিছু লোক দাঙ্গাবিরোধী কোনও কাজ করা যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে জড়ো হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রবিউদ্দিন, মোহায়মেন রোকেয়া কবীর, আবুল হাশেমের কন্যা প্রমুখ। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হল। প্রস্তাব হিসাবে আমি বললাম, 'শ্যাডো প্লে করব'। এই 'শ্যাডো প্লে' নিয়ে ছোটবেলায় আমি একটা মজার খেলায় কিছুদিন মেতেছিলাম। গ্রামের অনেক ভিখারিরা এসে ব্যালাড-গান গেয়ে শোনাত। কোনও একটা করুণরস বা বীররসের আখ্যান নিয়ে এইসব ব্যালাড রচিত হতো। একটি কাহিনী ছিল : এক দামাল ছেলে জঙ্গলে যেতে চায়, মা কিছুতেই যেতে দেয় না। কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চারের নেশা—সে যাবেই। মাকে লুকিয়ে একদিন জঙ্গলে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ল। বল্লম নিয়ে সাঙ্ঘাতিক লড়াই করেও শেষে সে মারা গেল। এই

রকম একটা গল্প। গানের কথাটা ছিল : 'মনাই যাইও না জঙ্গলের ধারে, বাঘে খাইব তোমারে, মনাই যাইও না জঙ্গলের ধারে'। এই মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হতো। যে ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল, সেই আঁতুরঘরটাই ছিল আমার খেলার জায়গা। একটা ধুতি টাঙিয়ে, কুপি জেলে, কাগজ কাটা আকৃতি বানিয়ে তার ছায়া ফেলতাম। গান গাইতাম আর ছায়ারা পর্দায় নড়াচড়া করত। দর্শক ছিল মামাতো ভাইবোনের দল। সেই হল আমার 'শ্যাডো প্লে'-এর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগে গেল। আমার আর একটা সাহসের কারণ ছিল। ১৯৪৪ সালে আই. পি. টি. এ.-র কেন্দ্রীয় শাখার পরিবেশনায় 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' দেখেছিলাম। তাতে নাচের ব্যবহার ছিল। ওই অনুষ্ঠানটি বিষয়-উপস্থাপনা ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করল। ব্রিটিশ কীভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাকে চারিয়ে তুলেছে এটাকে বিষয় করে আমার 'শ্যাডো প্লে' তৈরি করে ফেললাম। সঙ্গে ছিল ডায়লগ আর বাজনা। গোলাম কুদ্দুস, নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার / গদ্যের অংশ নির্বাচিত করেদিলেন। সেগুলির আবৃত্তি বা পাঠ চলত। নৃত্যশিল্পীরা নাচতেন আর তাঁদের ছায়া পর্দায় গিয়ে পড়ত। বলা যায় একজন কোরিওগ্রাফারের কাজ করলাম। ব্র্যাবোর্ন কলেজে আয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে 'শো' হয়েছিল মনে পড়ে। তবে গোটা কাজটা ছিল বেশ মোটা দাগের। উপযুক্ত আলো পাইনি, ফজলে লোহানি নামে একজন ফোটোগ্রাফারের লাইট ব্যবহার করে কাজ চালিয়েছিলাম। প্রথম 'শো' তে আপত্তি করলেও দ্বিতীয়বারে কলিম শরাফি নেপথ্যে ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর 'শের আলি' নাম নিয়ে লুকিয়ে এসেছিলেন সুরপতি নন্দী। গান গাওয়া ছাড়া এটাই আমার নিজের থেকে করা গণনাট্যের প্রথম কাজ।

এর আগে অবশ্য আমি একবার গণসঙ্গীতগায়ক হিসেবে কলকাতায় এসেছিলাম। সেটা ১৯৪৪ সাল। ছবি আঁকার সঙ্গে-সঙ্গে আমি গান গাইতাম। লোকসঙ্গীতে ছেলেবেলা থেকেই আমার আগ্রহ ছিল। গ্রামে বড় হয়েছি লোকসঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যেই। পালাকীর্তন, সংকীর্তন ইত্যাদি বাড়িতেই হতো। প্রজাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুর্দান্ত গাইয়ে। তাঁদের কণ্ঠে পদ্মাপুরাণের গান মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো। নদীর পারেই ছিল আমাদের বাড়ি। অনবরত নৌকার আসা-যাওয়া দেখতাম আর মাঝিদের গান ভেসে আসত। বর্ষায় চলত নৌকা বাইচ আর সঙ্গে অপূর্ব গান। এছাড়া, চাষিদের গলায় নানা ধরনের গান শুনেছি, 'ধামাইল' নাচ দেখেছি। আমার দিদিমা ছিলেন 'ধামাইল' নাচের একজন প্রবক্তা। অসাধারণ গাইতে পারতেন। দিদিমার নাম ছিল কাত্যায়নী পুরকায়স্থ, গুরুসদয় দত্তের বড়দি। আমার হাত ধরে তিনি পাড়া বেড়াতেন আর 'ধামাইল' হলেই সোৎসাহে নেচে উঠতেন। মামারবাড়ির সকলেই গানের সঙ্গে অল্পবিস্তর যুক্ত ছিলেন। কাজেই গানের একটা পরিমণ্ডল ছিলই, শুনে-শুনে আমার কান তৈরি হয়ে গেল, যদিও সঙ্গীতের কোনও পাঠ আমি তখনও নিইনি। মিউজিক এর ট্রেনিং প্রথম নিতে শুরু করি ১৯৫০ সালে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ। ওই প্রথম

আমার মাস্টার ধরে কোনও জিনিস শেখা। যাইহোক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস আবিষ্কার করলেন যে আমি গান গাইতে পারি, আমাকে বললেন 'চলে আসুন'। এইভাবে আমি আর নির্মল ( নির্মলেন্দু চৌধুরি ) মুখ্য গায়ক হয়ে গেলাম। দিনের বেলায় ছবি আঁকা আর সন্ধ্যার সময় গান। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে প্রোগ্রাম করছি। একটা সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর নির্মল দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে একাই বহু প্রোগ্রাম করে যেতে হয়েছিল।

২ : ০

ওই 'শ্যাডো প্লে'-র পরে গণনাট্যের "শহীদের ডাকে"-র প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত হই। তার মঞ্চ সজ্জায় টু-ডাইমেনশনাল সেট ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পরে চারমাস ধরে বাংলা আর আসামে পরিক্রমা চলল। ফিরে আসার পরে প্রবল বন্যায় আমার যাবতীয় ছবি বা অন্যান্য কাজ নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। তখন রণদিভের পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে মতপার্থক্য হতে থাকল। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই অল্প-অল্প করে ডিফারেন্স শুরু হয়। গানগুলো কেমন যান্ত্রিক মনে হতো। কোথাও যেন পৌঁছচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি গান ছিল : 'তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়, এই ভারতের হিন্দু-মুসলিম কে আছ কোথায়'। গানের সর্বশেষে ছিল : 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়—' ইত্যাদি! সমবেত নৌকা-বাইচের গ্রাম্য সুরে গান। এই গানের রিহার্সাল দিচ্ছি। নির্মল তখন ছিল না। হঠাৎ একজন ছাত্রনেতা বললেন, 'দেশে আন্দোলন ছাত্ররা কিছু করে না বুঝি? আপনারা ছাত্রদের কথা কিছু বলছেন না কেন?' হেমাঙ্গদা বললেন, 'হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। ওই কথাও তুমি লাগাইয়া দিও : ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলো দেশ-রক্ষার দায়'। আমরা সেভাবেই রিহার্সাল দিচ্ছি। এবারে মহিলা সমিতির এক মহিলা বললেন, 'আরে, মহিলারা বুঝি কিছু করে না?' আমরাও গাইলাম : 'আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়।' সবশেষে এলেন—যিনি আমাকে দিয়ে স্তালিনের ছবি আঁকিয়েছিলেন সেই বিনোদবন্ধু দাস। উনি ধাঙর ইউনিয়ন করতেন। উনি বললেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পিজান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'। সবার নাম গানে আছে, অথচ ওয়ার্কারদের নাম নেই! কী ধরনের গান গইছেন আপনারা?' অতএব শেষ লাইন যুক্ত হল : 'ধাঙর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলো দেশরক্ষার দায়।' ওখানে ধাঙররাই ছিল ওয়ার্কার। আমরাও একটা 'সব দেবতার নাম' দিয়ে লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি। মূল গানের তলায় লিস্টটা রেখে দিয়েছি। শিলচরে অনুষ্ঠান চলছে। মূল গানের শেষ লাইন 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো…' গেয়ে নির্মল ছেড়ে দিচ্ছিল। আমি ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে ইশারায় লিস্টটা দেখিয়ে দিলাম। নির্মল আমার দিকে একটু তাকাল, তারপর এক-নম্বর দু-নম্বর করে আমার সঙ্গে গেয়ে চলল। পরে নির্মল বলল, 'এসব কবে থেকে হল?' আমি বললাম, 'প্রত্যেকে এসে বলাতে হেমাঙ্গদাই

এসব জুড়ে দিয়েছেন।' অন্যান্য অনেক গানেই এধরনের জিনিস ঘটতে থাকল। এইখান থেকেই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগে। গানের মধ্যে যান্ত্রিকতাকে উপলব্ধি করতে শুরু করলেও সেটা ব্যাখ্যা করে কাউকে বুঝিয়ে বলার মতো বুদ্ধি তখন আমার নেই। কিন্তু বিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শুধু মনে হতো এটা ঠিক হচ্ছে না। এইসময় পার্টির আর একজন নেতা কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন যে আমাদের কাজ হল জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। কথাটা শুনে আমার মনে হল আমি তো নিজেই শিক্ষিত নই। অন্যকে শেখাব কী? গান গাইবার সময় গলা ছেড়ে দিই। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কী গান গাইলে—বলতে পারব না। একজনের অনুপস্থিতিতে আসাম-বাংলা পরিক্রমার সময়ে চারমাস পার্কসনস বাজিয়েছিলাম। সেটা বাজনা হয়েছিল, কী তার তাল আমি জানি না। ততদিনে আমার বয়স প্রায় ২৮ বছর। রোজগারপাতি কিছু নেই। না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা। মনে হল এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যার থেকে জীবিকার সমস্যাও কিছুটা মেটে আর নিজেকে শিক্ষিত করতেও পারি। তখনই আমার বেহালার তালিম নেওয়া শুরু। ১৯৫০ সাল। এই সময়ে আমি আই. পি. টি. এ.-র কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে চলে আসি। তার একটা কারণ ছিল। পার্টি তখন আন্ডার গ্রাউন্ডে। কাকদ্বীপ থেকে কয়েকজন এসে বললেন অনুষ্ঠান করার জন্য চার-পাঁচ জনের ছোট একটা দলকে পাঠাতে হবে। রাতারাতি কী করা যায়? সলিল (সলিল চৌধুরি) তখন ঝটপট একটা নাটক লিখে ফেলল। যারা গান গাইত তারাই নাটক করল। তাই নিয়ে তুমুল বিতর্ক—গানের দল কেন নাটক করবে? তখন আই. পি. টি. এ-তে ড্রামা ইউনিট, ব্যান্ডে ইউনিট আর গানের ইউনিট ইত্যাদি বিভাজন হয়ে গেছে। কাজের সুবিধার জন্য এটা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ডিসিপ্লিন রক্ষার ব্যাপারটা রিজিডিটির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বয়স কম থাকার ফলে মিটিং-এ চেঁচামেচি করেছিলাম। ড্রামা ইউনিটকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, 'গানের দল নাটক করলে কী হয়েছে? আপনারা এতদিন কী করছিলেন?' আইন তো আই. পি. টি. এ.-র জন্যই—নাকি আইনের জন্য আই. পি. টি. এ?' প্রকৃতপক্ষে চার-পাঁচ জনের টিমের ছোট নাটক ড্রামা ইউনিটের ছিল না। অবস্থার প্রয়োজনে গানের ইউনিট ওটা করতে বাধ্য হয়েছিল।

শিল্পগত নানা বিষয়ে শম্ভু মিত্র প্রমুখ তখন নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। "নবান্ন" নাটক যখন প্রথম প্রযোজনা হয় তখন একটা উত্তেজনা ছিল। উত্তর কলকাতার চিরাচরিত নাটকের ধরন ভেঙে, নতুন ভাষায়, নতুন ঢঙে উপস্থাপিত এক নতুন নাটক। সংলাপে উপভাষার ব্যবহার, একেবারে রাস্তার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জীবনকে মঞ্চে নিয়ে আসা—সবই নতুন এক ধারা। কিন্তু আঙ্গিকগতভাবে নাটকটির দুর্বলতা ছিল। এপিসোডিক। বাঁধুনি ছিল না। প্রথমবার পড়ার সময় নাটকের বিষয়বস্তু সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু সকলেরই মনে হল পাণ্ডুলিপির পরিমার্জন ও সম্পাদনা প্রয়োজন। বিজন ভট্টাচার্যের "জবানবন্দী" কে "নবান্নের" খসড়া বলা যেতে

পারে। অর্থাৎ "জবানবন্দী"র ইলাবোরেশন হল "নবান্ন"। নানা এপিসোড ভিড় করেছিল নাটকে। ফলে "জবানবন্দী"র মতো ইনটিগ্রেটেড চেহারাটা ছিল না। এছাড়া আবেগের প্রাবল্য যথেষ্ট থাকলেও নাটকটি শিল্পগত মানের দিক থেকে দুর্বল ছিল। তখনই শম্ভু মিত্র স্পাদনার কাজে হাত লাগালেন। আর এইখানেই ক্ল্যাশটা বাঁধল। আমার মতে, শম্ভু মিত্র এডিট না করলে "নবান্ন" মাইলস্টোন হতো না। এতে "নবান্ন" নাটকের উন্নতি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর পরে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের দূরত্বটা বেড়ে গিয়েছিল। যদিও ভিতরে আমরা চাইছিলাম বিজন ভট্টাচার্যের মতো একজন আবেগপ্রবণ নাট্যকার এবং শম্ভু মিত্রের মতো একজন ডিসিপ্লিনড ডিরেক্টর জোটবদ্ধ থাকুন। তাহলে দুর্দান্ত সব প্রোডাকশন হতে পারত। পরবর্তীকালে বিজনদার অনেক নাটক দেখতে গিয়ে কোনও দৃশ্যের দুর্বলতা দেখে আমার কেবলই মনে হতো, যদি এটা শম্ভু মিত্রের হাতে পড়ত! কিন্তু তখন সেটা আর হবার নয়। শম্ভু মিত্র প্রমুখ একসময় মনে করতেন যে আমরা প্রকৃতপক্ষে 'স্লোগান-মংগারিং' করে চলেছি। ওঁরা মনে করতেন শিল্পের দিকে জোর দেওয়া উচিত। স্লোগানে তাঁদের আপত্তি ছিল না, দুর্ভিক্ষের কথা বলতেও আপত্তি ছিল না কিন্তু তাঁরা চাইতেন শিল্পের শর্ত মেনে কাজটা হোক। শিল্পের বদলে প্রচার প্রাধান্য পেতে থাকুক—পার্টির দিক থেকে এমন একটা চাপ ছিল। এইখানেই ওদের সঙ্গে আই. পি. টি. এ.-র ডিফারেন্স হয়ে গেল।

আই. পি. টি. এ-তে আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলাম, ভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু ওই ভাবনার পেছনে কোথাও একটা শিল্পী-মন ছিল। চেয়েছিলাম আমাদের কাজটা শিল্পায়িত হোক। কিন্তু রেজিমেন্টেশন, যান্ত্রিক চিন্তাধারা, স্লোগান-মংগারিং ইত্যাদিই মুখ্য হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত আই. পি. টি. এ.-তে ওই ধারাই প্রবহমান। একই জায়গায় রয়েছে। এক ধরনের পুনরাবৃত্তির ছকে কাজ হয়ে চলেছে। সব কাজই ইস্যুভিত্তিক। কখনও হরতাল, কখনও সাম্প্রদায়িকতা, পার্টি প্রোগ্রাম যেমন হয়ে থাকে। যেমন যান্ত্রিক নাটক তেমনই তার কম্পোজিশন। এ কারণেই হয়ত প্রকৃতই যাঁরা সৃষ্টিশীল তাঁরা আই. পি. টি. এ. থেকে সরে গেছেন। এই সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে বিরোধের কারণে যেমন অনেকে সরে গেছেন, তেমনই কিছু লোক ছিলেন যাঁরা হয়ত সৃষ্টিশীল হলেও ধান্দাবাজ। আই. পি. টি. এ-কে তাঁরা একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এই বৃহৎ প্ল্যাটফর্মে নানা উদ্দেশ্যে নানা লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে পারি যে, আই. পি. টি. এ-র নাম ভাঙিয়ে আমি অন্তত কিছু করিনি।

ইস্যুভিত্তিক ব্যাপার বা লিফলেটিং-এর একটা প্রয়োজন হয়ত আছে। কিন্তু লিফলেটটা লিটারেচার নয়। কোনও-কোনও লিফলেট হয়ত লিটারেচার পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। আবার এটাও ঠিক যে সমস্ত লিটারেচারই প্রচারধর্মী। সুপ্তভাবে হোক বা জাগ্রতভাবে হোক তার ভিতরে একটা বার্তা থাকেই। তার সারবস্তুটাই তার প্রচারের

দিক নির্দেশ করে। আবার হয়ত দেখা গেল লেখকের উদ্দেশ্য একপ্রকার হলেও লোকের কাছে তা ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে গেল। গণনাট্যে ওই লিফলেটিংটাকেই প্রধান করে ধরে নেওয়া হল। আমি হয়ত ছবি আঁকছি—পার্টির কোনও কর্মী যেতে যেতে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোস্টার আঁকছেন?' ওঁদের কাছে পোস্টারটাই ছিল চূড়ান্ত ব্যাপার। আমিও তাই ভাবতাম। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে যখন পেট চালানোর দায়ে বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকছি তখনও আমার মনে হত প্রচ্ছদ অঙ্কনই বুঝি শ্রেষ্ঠতম শিল্প। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে দেখলাম আসলে পরের মুখে ঝাল খাচ্ছি। ওটা শিল্প-টিল্প কিছুই নয়।

৩ : ০

১৯৫০ সাল থেকে আমি বেহালা বাজাতাম। শম্ভু মিত্র একদিন এসে বললেন, 'তোমার নাটকে আগ্রহ নেই?' আমি বললাম 'না'। উনি বললেন 'তোমার টাকার দরকার নেই?' আমি বললাম, 'আছে। কিন্তু গণনাট্যের অভিজ্ঞতায় জানি যে নাটক করে টাকা হয় না।' তা সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, বাড়িতে যাতায়াত। এরপরে যখন বহুরূপী হয়েছে, তখন একদিন এসে ফেস্টিভ্যালের জন্য পোস্টার করে দিতে বললেন। "ছেঁড়া তার" আর "চার অধ্যায়" দেখানো হয়েছিল। আমি পোস্টার করে দিলাম। এরপরে "ধর্মঘট" নাটকের সময় 'সেট' করে দেবার জন্য অনুরোধ এল। আমি সেটের কিছুই জানি না, অথচ ওঁর অনুরোধও ঠেলতে পারি না। গেলাম একদিন। ওঁরা নিজেরা যা করেছিলেন সেগুলোই একটু দেখে দিলাম। আর নাটকের মিউজিকটা দেখিয়ে দিলাম। কারণ ওটাই আমার আওতার মধ্যে ছিল। এর পরে "রক্ত করবী"র ব্যাপারটা শুরু হল।

আগে ১৯৪৯ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে শ্রীরঙ্গমে ওই নাটকের একটি অভিনয় হয়। তাতে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন: শম্ভু মিত্র—রাজা, কালী ব্যানার্জি—সর্দার, দেবব্রত বিশ্বাস—বিশু পাগল, চন্দ্রা—তৃপ্তি মিত্র এবং নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কণিকা মজুমদার। আমি আর সূর্য রায় মিলে একটা সেট করেছিলাম। নাটকটা তখনই পড়া ছিল। কিন্তু খুবই ঝাপসা একটা ধারণা হয়েছিল তাতে। মনে হয়েছিল নাটকের ভিতরে একটা শক্তি রয়েছে কিন্তু তাকে যথার্থ বোঝার মতো ক্ষমতা বা বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। শুধু বুঝতে পারতাম যে আই. পি. টি. এ.-তে আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলোই অনেক জোরালোভাবে এ। নাটকে বলা রয়েছে। পরবর্তীকালে যখন শম্ভু মিত্র "রক্তকরবী"র প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন তখন নাটকটা আবার পড়ে ফেললাম। তখন মনে হল 'আরে এ যে দারুণ জোরালো ব্যাপার।' শম্ভু মিত্র বললেন, 'কী, করা যায়?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই! কেন করা যায় না?' এইভাবে নাটকে জড়িয়ে পড়ি। রোজ রিহার্সাল দেখি, ক্যারেকটার, ডায়লগ নিয়ে শম্ভু মিত্রর আলোচনা শুনি। আমিও আমার মতো করে ভাবছি। এদিকে মিউজিকের দায়িত্বও

রয়েছে। তখনও সেট নিয়ে কী করব কিছুই জানি না। সাহিত্যের নাটকটা কী করে জান্ত নাটক হয়ে ওঠে সে বোধ আমার একেবারেই ছিল না। শম্ভু মিত্র একদিন কাগজের মডেল বানিয়ে বললেন, 'এটা রাজার ঘর, এটা অন্ধক—ইত্যাদি।' আমি ভাবছি এতবড় একটা স্টেজ রয়েছে, এতটা স্পেস রয়েছে, তাতে থ্রি-ডায়মেনশনাল একটা জায়গা পাচ্ছি। কী দিয়ে তাকে ভরাট করব? রাজার ঘরই বা কেমন হবে? আস্তে আস্তে নাটকের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করলাম। প্রশ্ন এল : এই রাজা কে? সর্দারই বা কে? মনে-মনে তাদের চেহারাগুলো অ্যানালিসিস করতে থাকলাম। কার্ডবোর্ডের মডেলে শম্ভু মিত্র তখন এক নম্বর দু-নম্বর করে প্রবেশ-প্রস্থানের রাস্তা চিহ্নিত করে অভিনেতাদের বোঝাচ্ছেন। আমিও বোঝার চেষ্টা করছি। যতই রিহার্সাল দেখতে লাগলাম ততই নাটকটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কিন্তু মঞ্চের উপরে কীভাবে সেট-গুলোকে দাঁড় করাতে হয় তার কোনও জ্ঞান আমার ছিল না। সীতাংশু মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন কীভাবে স্ট্রাকচারগুলো দাঁড় করাতে হয়। তখন আমি ডিজাইনের কাজ শুরু করলাম। এই ডিজাইনগুলো আস্তে-আস্তে অনেকটাই পালটে গেছে। প্রতিটি অংশই নির্মিত হয়েছে নির্দিষ্ট যুক্তিকে মেনে। শম্ভু মিত্র আমাকে নানা জিনিস বুঝতে সাহায্য করেছেন। যেমন, প্রথমে 'মকর মুখ' জিনিসটা কী ঠিক বুঝতাম না। পরে যখন 'রাজার এ'টো'-র তাৎপর্য ধরতে পারলাম তখন 'মকর মুখ'-এর একটা আর্কিটেকচারাল চেহারা নিয়ে এলাম। নাটকে যা বর্ণনা করা হচ্ছে সেটাই কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়। ওর একটা আর্কিটেকচারাল রূপ থাকা দরকার, একটা পিকটোরিয়াল রূপ থাকা দরকার, এবং অভিনেতাদের গতির সঙ্গে একটা গতিশীলতাও বজায় রাখা চাই। পিকটোরিয়ালিটি আনার জন্য আমাকে লিনিয়াল আসপেক্টগুলো দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ কোনখানে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিকাল লাইনের ব্যবহার হবে অথবা কোথায় ত্রিভুজ আসছে কোথায় চতুর্ভুজ আসছে, কোথায় বক্ররেখা আসছে—রেখাগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে। ঠিক করে নিতে হবে কীভাবে প্রয়োজনবোধে মুড অনুযায়ী এই রেখাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। কারণ রেখার দ্বারাই তো আমাদের 'মুড'-এর বদল হয়। আমাদের মুখের অভিব্যক্তি পালটে যায় রেখার বদল ঘটলে। হাসি-কান্না-রাগ-মন খারাপ ইত্যাদি মানসিক অবস্থার বিভিন্নতায় রেখারাও পালটে যেতে থাকে। এই রেখাগুলো কীভাবে ব্যবহার করব তাই নিয়ে ভাবতে থাকলাম। একটা জায়গায় আছে বিশু পাগল বলছে : আয়রে ভাই লড়াইয়ে চল। সে উঁচুতে উঠে চিৎকার করে আর তার চারপাশে সবাই জড়ো হয়। আমার পিরামিডের চেহারাটা মনে হল। মনুমেন্টাল একটা আকারে কম্পোজিশনটা গড়া হল। রাজার ঘরের সামনে যে জাল ছিল—প্রথমে সেটা গগন ঠাকুরের আঁকা "রক্তকরবী" বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে হুবহু অনুকরণ করে তৈরি করা হয়। পরে সেটা সম্পূর্ণ বদলে দিলাম। পরে দরজাটা উপরে-নিচে হাঁ-হয়ে খুলে যেত আর মকর-মুখের চেহারাটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসত। রক্তকরবীতে যে সমস্ত এলিমেন্টস আছে—রাজা বা নন্দিনী যে সমস্ত কথাবার্তা-

গুলো বলে ওই সমস্ত কিছু ওই দরজার কম্পোজিশনে ধরা আছে। সুপার-ইমপোজ করা হয়েছে। চট করে দেখলে মনে হবে গগন ঠাকুরের ছবি, আসলে কিন্তু তা নয়। নাটকটা যত ভাল করে বুঝেছি ততই পরিবর্তনের কাজ চলেছে। বেসিক কোরিওগ্রাফিকে অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন স্কিবলের চেহারা পাল্টে গেছে, রূপ বদলে গেছে। দরজাটা আগে খাড়া মতন ছিল পরে উপরটা এমনভাবে ঢালু করে দিলাম যা দেখে বাংলা দেশের কোনও কুঁড়েঘরের চেহারাটা মনে আসে। এক নজরে হয়ত এটা কিছুই কনভে করে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটা বাংলারই নাটক। যখন বলা হয় 'তুমি তো আমাদের ঈশানী পাড়ার নন্দিনী' তখন আমাদের অতি পরিচিত বাঙালি মেয়েটিকেই যেন চিনে নিই। একই সঙ্গে নাটকটি আবার বিশ্বজনীনও বটে। পৃথিবীর যে কোনও জায়গারই চেহারা হতে পারে এটা। রাজার ঘরটি এমনই একটা জায়গা যেখানে নন্দিনীও বারবার আকৃষ্ট হচ্ছে আর রাজাও সেখানে নির্জনতার আড়াল ভাঙতে চাইছে। নির্জন ঘরটি হয়ে ওঠে তার একাকীত্বের নীড়। আর তারই দ্যোতক ওই কুঁড়েঘর। এটা খুবই সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত। কেউ বুঝলে ভাল, না বুঝলেও কিছু এসে যায় না। এছাড়াও ওতে বিভিন্ন ডিটেলস্ আছে। তাতে বকযন্ত্র, মরা ব্যাঙ এমনকি পরবর্তীকালে অ্যাটমিক এনার্জিও চলে এসেছে। রাজার সংলাপে আছে : '...ওটা একটা মরা ব্যাঙ। হাজার বছর টিঁকে ছিল। কী করে বেঁচে থাকতে হয় জানে না।' যে শুধুই টিকে থাকে তাকে রাজা সহ্য করতে পারে না। মরা ব্যাঙটি দিয়ে 'টিঁকে থাকা মানুষ'কেই তো বোঝানো হয়। রাজা সেই 'মানুষ' এর ঊর্ধ্বে যেতে চায় কিন্তু পারে না। তথাকথিত কাজের জগতে সে আটকে থাকে। কিন্তু জীবনের প্রতি সে আকৃষ্ট। নির্জন নীড় সে ভাঙতে যায় তবু পারছে না। এই ইমেজগুলো কিন্তু নাটকের মধ্য থেকেই আমার কাছে উঠে এল। পরে ইমেজগুলোকে আমি আস্তে-আস্তে বদলাতে শুরু করি। এইটেই আমার নাটক দেখার বা নাটকের সেট করার সূত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল।

"রক্তকরবী"র পরে যখন "পুতুল খেলা"র সেট করি তখন ওই রেখাকেই ব্যবহার করলাম। মানুষ আঘাত পেলে ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ, একটা ডাউন ওয়ার্ড কার্ভ-এর চেহারা পাওয়া গেল। মুখোশে হাসি আর কান্নার অভিব্যক্তি বোঝাতে আমরা ঠোঁটের রেখাটিকে কখনও উপরদিকে আবার কখনও নিচের দিকে বাঁকিয়ে দিই। ডাউন ওয়ার্ড কার্ভ-এ বেদনার অভিব্যক্তিই ধরা পড়ে। এটার একটা সূক্ষ্ম ব্যবহার করলাম। সেটটা এমনি দেখলে মনে হবে একটা মধ্যবিত্তবাড়ি। তাতে দরজা আছে, জানালা আছে, চেয়ার, আলনা ইত্যাদি নানা আসবাব আছে। প্রত্যেকটা জিনিসেই ওই কার্ভটা আছে। ওটা হিসাব করে রাখা হয়েছে। একটা জায়গায় নোরা ধরা পড়ে যায়, ভেঙে পড়ে কিন্তু বাইরের দিক থেকে প্রত্যাশার ইঙ্গিত থাকে। কার্ভটাও ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আবার নিচের দিকে নেমে দরজার দিকে বাইরে বেরিয়ে যায়। একটা সময়ে তিনটি কার্ভের ব্যবহার হয়। একটিতে নোরার একাকীত্বের বেদনাকে ধরা হয়। ক্রগস্টাড প্রথমে ব্ল্যাকমেল করে পরে জীবনের

আশ্বাস পেয়ে ও কাজ ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়টিতে এই ক্রগস্টাড চরিত্রটির বিশেষ মুহূর্তের বিষণ্ণতা ধরা পড়ে। এছাড়া, বিছানার মধ্যেও একটা একাকীত্বের ব্যাপারকে বোঝানো হয়। আবার টোট্যালিটিতে শেষ পর্যায়ে নোরার বেরিয়ে যাবার সময় টরভাল্ড ভেঙে পড়ে। কার্ভটি ওখানে সম্পূর্ণ হয়। ত্রিকোণাকার, চতুষ্কোণ কিংবা বৃত্তাকার রেখাকে নানা অভিব্যক্তির রূপ প্রকাশে ব্যবহার করা যায়। একটি বৃত্তকে ভেঙেই যেমন আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড এই দুটো কার্ভ পাওয়া যায়। আবার তাদের পরপর সাজিয়ে দিলেই তরঙ্গায়িত একটা গতির ব্যঞ্জনা চলে আসে। নাটকের সুর অনুযায়ী কখনও লাইন এবং কখনও মাস-কে আমি স্পেসের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। ধরা যাক একটা সাধারণ দরজা আছে। কিন্তু দরজার দুদিকের দৈর্ঘে বা প্রস্থে অসমতা নিয়ে আসা হল। অর্থাৎ একটা ডিসটরশন ঘটানো হল। কেন? কারণ কোনও একটি চরিত্রের মধ্যে আমি ওই ডিসটরশন দেখতে পেয়েছি। কোনও অ্যাংগুলারিটি দেখতে পেয়েছি। সময় এবং স্পেসকে ধরার জন্য আমাকে পেন্টিং, স্কাল্পচার, আর্কিটেকচার ইত্যাদির নানা শিল্প বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করতে হয়। সেটের প্রাথমিক চিন্তা নাটকের বিষয় থেকেই উঠে আসে। তারপরে দেখতে হয় কী ধরনের নাটক। যদি সুররিয়্যালিস্টিক প্যাটার্নের হয় তবে সম্পূর্ন সেটেও সুররিয়্যালিজমকে ব্যবহার করব। ইম্প্রেশনিস্টিক হলে সেভাবেই ভাবব, যদি বারোক প্যাটার্নের হয় তবে চেষ্টা করব বারোক ধরনের আর্কিটেকচার ব্যবহার করতে, একই আকৃতির পৌনঃপুনিক ব্যবহার করে একটা ছন্দকে ধরতে চাইব সেক্ষেত্রে হয়ত মঞ্চের উপর পরপর অনেকগুলো স্তম্ভের নির্মাণ করা হল। "রক্তকরবীর" ক্ষেত্রে কিন্তু কোনও বিশেষ ধরনের শিল্পরীতিকে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। ওতে কিউবিজম স্ট্রাকচারালিজম সব মিশে গেছে। কারণ চরিত্রগতভাবে নাটকটি মিশ্র ধরনের। একই সঙ্গে নাটকের মধ্যে প্রতীক আছে আবার জীবন্ত চরিত্র আছে। নাম ধরে ডাকা হয় এমন চরিত্র আছে আবার কারুর বা নাম নেই। যেমন ফাগুলাল, আবার সর্দার। রাজা একটি প্রতীক চরিত্র, রঞ্জন একটি রূপক চরিত্র। একটা আইডিয়া। নাটকে নির্দিষ্ট কোনও স্থান দেওয়া নেই। কিন্তু তাদের এমন একটা স্থানে আনতে হবে যাতে প্রত্যেকেই খাপ খেয়ে যায়। "রক্তকরবী" ঠিক কী ধরনের নাটক বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ কোথাও হয়ত যাত্রার এলিমেন্ট ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুগতভাবে নাটকটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের। যান্ত্রিক সভ্যতা তো পাশ্চাত্য বিষয়। আবার নন্দিনীর 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গান একেবারেই দেশজ, মাটির ব্যাপার। মঞ্চে যে কোনও চরিত্রের চট করে চলে আসা এটা যাত্রাতে সম্ভব। "রক্তকরবী"র মঞ্চভাবনা সেই সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার কাছে এসেছিল। মনে হল 'এটা হওয়া উচিত'—সেভাবেই কাজ করলাম। আজ সেই কাজের বিচার বিশ্লেষণ যতটা করতে পারি তখন আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। উত্তর কলকাতার কোনও মঞ্চের নাটকও আমার দেখা ছিল না। যা দেখে মঞ্চের একটা আইডিয়া পেতে পারি। "রক্তকরবী"র বহু পরে আমি প্রথম পেশাদারি মঞ্চের নাটক দেখি—"ক্ষুধা"। এমনকি শিশিরবাবুর কোনও নাটকও আমার

দেখা হয়নি।

নাটকের ক্ষেত্রে এখনও আমি নিজেকে জলজ্যান্ত অশিক্ষিত লোক বলে থাকি। কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই আমার। শুধু প্রচুর পেন্টিং দেখা ও মিউজিক শোনা ছিল। অর্থাৎ ছবি আর সঙ্গীতের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার। ওটাই পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। এখনও সেটে ব্যালান্স আর রিদম-এর সমস্যা মেটাতে সঙ্গীতের বোধ কাজ করে। যদিও মিউজিক আর পেন্টিং-এর ইন্টারঅ্যাকশনটা আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত হয়নি।

"রক্তকরবী"র পরে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখা নাটক "কালের যাত্রা"। এটিও পাশ্চাত্য জীবনধারা বিষয়ে একটি প্রতিক্রিয়া। "রক্তকরবী"র নাটকীয় উপাদান বেশি হলেও "কালের যাত্রা"র স্পষ্টতা অনেক বেশি। পরিষ্কার একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার পাওয়া যায় ওতে। তিনজন মন্ত্রী, তিনজন নাগরিক, তিনজন সৈন্য, তিনজন মহিলা, একজন সন্ন্যাসী, একজন কবি, একজন পুরোহিত—নানা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে তুলে ধরে। যেন একটা প্রবন্ধের নাট্যরূপ। ব্যক্তি মানুষ কেউ নাটকে নেই। বিভিন্ন শ্রেণী আছে। এই নাটকে আমি স্ট্রাকচারাল সেট করলাম। একটা 'কাল' বা সময়কে পিকটোরিয়ালি ধরতে হবে। আবার ফ্যাংশনাল আসপেক্টটাও দেখা চাই। আমি এমন জিনিসই ব্যবহার করতে চাই যেটা ফাংশনাল হবে এবং একই সঙ্গে পিকটোরিয়াল বা স্কাল্পচারাল হবে। কিন্তু সহজেই চেনা যাবে। সময়ের প্রতীক হিসাবে ঘড়ি ব্যবহার করলাম। কাঁটাযুক্ত ঘড়ি দিলে সেটা ফাংশনাল হবে না, আমি সেটা ব্যবহার করতে পারব না। দেখাতে হবে ঘড়িটা অচল, কিন্তু শূদ্রদের হাতে যখন দড়িটা পড়ে ঘড়ি তখন সচল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সময় শূদ্রদের পথ করে দেয়। মঞ্চের পিছনে বেত দিয়ে বালু-ঘড়ির কাঠামো নির্মাণ করি। আবার দুটি পর্দাকে দুপাশে সরিয়ে মাঝখানে এমন একটি অংশকে অনাবৃত করা হতো যা দেখলে মনে হতো ঘড়ির নিচের প্রকোষ্ঠে কিছুটা বালি জমেছে, অর্থাৎ সময় কিছুটা এগিয়েছে। আগে ওমর খৈয়ামের ইলাস্ট্রেশনে এই বালু-ঘড়ি এঁকেছিলাম। একজন জ্ঞানীলোক যখন পৃথিবীর সব কিছু জেনে ফেলল তখন তাঁকে বলা হল, তোমার সময় হয়ে গেছে, এবার চলে এসো। এইভাবে পেন্টিং-এর অভিজ্ঞতা স্টেজে কাজে লেগে গেল।

"পাগলা ঘোড়া" নাটকে একটি মেয়ে মারা গেছে আর চারজন লোক তাকে পোড়াতে এসেছে। তাঁরা মদ খেতে-খেতে নিজেদের কাহিনী বলতে থাকে। আর ভূতের মতো মেয়েটি মাঝে-মাঝে গাছের ফাঁকে উঁকি দেয়। ভৌতিক একটা পরিবেশ আনতে হবে। চালাটাকে হেলিয়ে রেখে ডিসটর্টেড করে দিলাম। আস্ত গাছ না রেখে গাছের একটা কঙ্কালের চেহারা রাখলাম। এছাড়া শ্মশানের কিছু ডিটেলস থাকে। শ্যামানন্দ জালান নির্দেশিত "পাগলা ঘোড়া"র হিন্দি রূপান্তরের সেটটা মোটামুটি এইরকম। কিন্তু বাংলা নাটকে অন্যভাবে করেছি। শম্ভু মিত্রের ভাবনায় নাটকে প্রেমটা ছিল জৈবিক প্রেম। আমিও তখন সেভাবে ভাবলাম। ভাবনার সম্পূর্ণ 'কী-নোট'টা

পাল্টে নিতে হল। সংগীতে যেমন 'মধ্যম'-কে 'সা' ধরে নিলে সমস্ত নোটের সম্পর্ক-গুলোই পাল্টে যায়—একটা নতুন স্কেল পাওয়া যায়। জৈব চেহারাকে নাটকে আনতে আমি কপুলেটিং, এমব্রেসিং, কিসিং, স্কাল্পচার-এর ফর্ম ব্যবহারও করেছি। তাপস সেনকে শুধু বলে দিলাম যাতে দর্শকের রুচি বাঁচিয়ে আলোর ব্যবহারটা করেন। আবছা আলোয় শুধু সাজেশনস থাকে।

মঞ্চসজ্জায় আলো ও রঙের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে গিয়ে "পুতুল খেলা"র প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। রেখার ব্যবহার নিয়ে আগে বলেছি। নাটকটিতে মনস্তত্ত্বের নানা জটিল দিক ছিল। দর্শকের মধ্যে ওই সাইকোলজিকাল এফেক্ট আনতে গিয়ে আমি এমন একটা রঙ ব্যবহার করলাম যা সাধারণভাবে করা উচিত নয়। নোরা আর তার স্বামীর মধ্যে প্রচণ্ড মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন চলছে। সে নিজে যা নয় তাই স্বামীর কাছে দেখাতে চাইছে। কিন্তু স্বামীর উপকারের কথা ভেবেই সে টাকাটা ধার করেছে। অন্যদিকে স্বামী শুধু বড়-বড় নীতির কথা বলে, আসলে লোকটি নীচ প্রকৃতির। দুটো মানুষের পরস্পরকে বুঝতে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সত্য উদ্ঘাটিত হয়। নোরা বলে ওঠে : 'এতদিন একটা অচেনা লোকের সঙ্গে আমি থেকেছি। আজ জানতে হবে আমি কে।' গোটা মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক রাখলাম। তার ওপরে মঞ্চসজ্জায় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করলাম। একটা ধাক্কা দেওয়ার অভিপ্রায়ে ক্লোম ইয়েলো রঙটাকে ব্যবহার করলাম। বিছানার কভার, দুটো পর্দা, কুশন ইত্যাদি সব ওই রঙের। ক্লোম ইয়েলোতে আলো ফেলে একটা দারুণ উজ্জ্বলতা পাওয়া গেল। যাকে বলে ড্যাজলিং এফেক্ট। এছাড়া অন্যান্য আসবাব সবই দৃশ্যমান। জানালা দিয়েও শরতের উজ্জ্বল আকাশ দেখা যাচ্ছে। যেন বাইরের সূর্যকে টেনে ভিতরে আনা হয়েছে। বানানো সংসারের উপর বাইরের ওই উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে নোরার সমস্ত আউটলাইনকে মুছে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পরিচয় রেখাকে মুছে দিতে চাইছে। নিজেদের বানানো জিনিসে তাদেরই অস্তিত্ব লোপ পেতে চলেছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে নোরাকে হাতে উল-কাঁটা নিয়ে বুনতে দেখা যায়। লাল আর ধূসর রঙের উল। টরভ্যাল্ড বলে : 'কেউ এসেছিল। নোরা : কই না তো! টরভ্যাল্ড : আশ্চর্য! দেখলাম যেন··· নোরা : হ্যাঁ, হ্যাঁ এসেছিল—। টরভ্যাল্ড : তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন?' এরকম সংলাপের পরেই নোরার হাত থেকে উল-এর বল পড়ে যায়। তার মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেছে। তাড়াহুড়োতে গোটাতে গিয়ে লাল আর ধূসর বর্ণের উল জড়িয়ে-পাকিয়ে যায়। এমনিতে দেখলে মনে হয় সাধারণ, নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ভীষণ ক্যালকুলেট করে ওটা রাখা হয়েছে। অঙ্কের হিসাবটা জানি শুধু আমি, দর্শক নয়। তাদের উপরে শুধু সাইকোলজিকাল এফেক্টটা গিয়ে পড়ে। পরের দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা বিষাদময় হয়ে ওঠে। সমস্ত মঞ্চে ধূসর রঙের চাদর, কুশন ইত্যাদির উপরে ছড়িয়ে পড়ে লাল রঙের মাকড়সার জাল। কারণ মূল নাটকে এর পরেই আছে ট্যারেনটুলা নাচ। ট্যারেনটুলা অর্থাৎ রূপকথার সেই বিষাক্ত মাকড়শা যা কামড়ালে ওঝা এসে নেচে-নেচে

বিষ ঝেড়ে দেয়। নাচের বদলে শম্ভু মিত্র ওখানে "ঝুলন" কবিতাটির অনবদ্য ব্যবহার করেন : 'পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা'। অন্য একটি জায়গায় নোরা একাকীত্বে ভীত। তখন ঘরের পর্দার রঙ পালটে গেছে। তাতে আলট্রা মেরিন ব্লু আর ভার্মিলিয়ন রেড-এর কম্বিনেশনে সাধারণ আল্পনা আঁকা। দেখে মনে হতো যেন কেউ তাকিয়ে আছে। গা ছমছম করে উঠত। অ্যানক্যানি একটা ফিলিং হতো। শুধুই রঙের ব্যবহার।

তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় পরবর্তীকালে যখন রঙ্গকর্মীর "গুড়িয়াঘর" ( পুতুল খেলা ) হয়, আমার নতুন ধরনের সেটের পরিকল্পনা মাথায় এল। আর রেখার ব্যবহার নয়, আমি চাইলাম পাখির খাঁচার আকার ব্যবহার করতে। সবই ট্রান্সপারেন্ট। কে ঢুকল, কে বেরুল, সবই দেখা যাবে। শুধু খাচার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটা দশাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত সেটা করা আর সম্ভব হয় নি।

৪ : ০

সিমফনির ক্ষেত্রে একই মিউজিক বিভিন্ন কন্ডাকটরের পরিচালনায় নানা ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়। টোসকানিনির বাজনা এক রকম, জুবিন মেহতারটা আরেকরকম। ইনটারপ্রিটেশনটা ভিন্নতর হয়ে যায়। একটি নাটকের ক্ষেত্রেও নির্দেশক কীভাবে ভাবছেন সেটাই প্রধান হয়ে ওঠে। সিমফনিতে মূল ভায়োলিনের সঙ্গে কাউন্টার হিসাবে দ্বিতীয় একটা ভায়োলিন থাকে। নইলে সিমফনির ডায়মেনশন তৈরি হয় না। নাটকে আমার ভূমিকাটি ওই দ্বিতীয় ভায়োলিনের মতো। শুধুমাত্র দ্বিতীয় ভায়োলিন বাজলে কিছুই শোনা যায় না। মূল ভায়োলিনের সঙ্গে সুরের মিলনে সে 'হার্মনি' তৈরি করে। নাটকে নির্দেশকের ভূমিকাটিই প্রধান। আমি তার সঙ্গতকারী তার অনুগামী নই, তার সহায়কারী। সেট তৈরির ক্ষেত্রে আমি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করি। কোনও নাটক সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ইনটারপ্রিটেশন আমার যাই থাকুক, মেলোডি অনুযায়ী কাউন্টার মেলোডি সৃষ্টি করাই আমার কাজ। নাটকের নির্দেশকের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে মূল নাটকটাই পালটে গেল এমনটা হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। দেখা গেছে পিটার হলের মতো অল্পবয়সী পরিচালকের ব্যাখ্যায় লরেন্স অলিভিয়ারের মতো সেরা অভিনেতা মন দিয়ে শুনছেন। কারণ নতুন ধরনের ব্যাখ্যা শুনতে তিনি প্রকৃতই আগ্রহী। একই নাটকের ভিন্নতর ব্যাখায় আমাকেও ভিন্নতর সেটের কথা ভাবতে হয়। নতুন আইডিয়ার সন্ধান করতে হয়। এটা এক অর্থে যেমন আমার খুশির কারণ, অন্যদিকে চিরন্তন অখুশির কারণও বটে। যেহেতু বরাবরই আমাকে ওই দ্বিতীয় ভায়োলিনের কাজটা করে যেতে হয়। এই কারণেই নিজেকে নাটকের 'নির্বেদিত প্রাণ' কর্মী না বলে 'হাফ-হার্টেড' কর্মী বলে থাকি।

শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। নাটকেও যদি ফর্মের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে তবে আমিও সেভাবে চেষ্টা করতে পারি। যেমন একটি

স্বপ্নদৃশ্য। সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা মিলিয়ে স্বপ্নের একটা অদ্ভুত জগত থাকে। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পরেও যদি তা মনে থাকে তবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। ওই অনুভূতির কিয়দংশও যদি আমি এনে দিতে পারি, ওই আমেজটা যদি ধরতে পারি, তাহলেই সেই স্বপ্নের জগতকে দর্শক নিজের অভিজ্ঞতার জগতে আইডেনটিফাই করতে পারবে। মনে করা যাক একজন লোক ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল—পড়ার সময় স্লো-মোশানে তার দেহটি শূন্যে দু-তিনটি পাক খেল—কেউ বসে-বসে এটা ভাবছে। এই যে চিন্তার জগতের একটি ঘটনা যদি কোনও ভিভাইস-এর সাহায্যে ব্যক্ত করতে পারি তাহলেই ওই ঘটনাজনিত অস্বাভাবিক অনুভূতিকে জাগাতে পারব। অর্থাৎ ইমেজ-এর দাবিতেই আমি তখন টেকনিক্যালিটির সন্ধান করতে থাকব।

৫ : ০

বর্তমানে আমাদের সমাজ-জীবনে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আজকের নাট্যপ্রয়াসকে তারই প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। স্রষ্টা ও ভোক্তা দুইয়ের মধ্যেই এই অস্থিরতা প্রতিফলিত। আজ যা দেখি, আগামীকাল তা দেখে আর সন্তুষ্ট হই না। আমার ছেলেবেলার চুষিকাঠিটি আমার পরেও ভাইবোন সকলেই পরপর ব্যবহার করে গেছে। আজকের শিশুর হাতের খেলনা পাঁচ মিনিটও টেকে না। তাও চুষিকাঠি নয়—লিওটয়। বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। বস্তুত আমাদের চাহিদা এখন পণ্যেরই চাহিদা। অস্থিরভাবে নিত্য নতুন জিনিস পেতে চাইছি। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির কাজ কোনও চটজলদি উৎপাদনের রীতিতে হতে পারে না।

শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের মতো নাট্য প্রতিভারা আই পি. টি. এ. রীতির মধ্যে যে খামতি ছিল তা শুধরে নিয়ে নতুনভাবে চেষ্টা করেছেন এবং একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু তাঁদের সীমাবদ্ধতাগুলো তাঁরা নিজেরা ধরতে পারছেন না। ফলে উত্তরসূরীদের হাতে নতুন কোনও ধারা তুলে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এখন যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা ততটা ক্ষমতাবান নন। তেমন নাট্যকারই বা কোথায়? চাহিদা মেটাতে পাশ্চাত্য অনুবাদ নাটকের আমদানি চলছে। কিন্তু এই 'ফাস্ট ফুড'-টিও খিদে মেটাতে পারছে না।

শিকড় থেকে আমরা সরে গিয়েছি। ফুল ফোটাচ্ছি ঠিকই, তবে তা কচুরিপানার ফুল। কচুরিপানার মতোই ভেসে চলেছি। তবে এ অবস্থাই যে চিরস্থায়ী হবে এমনটা মনে করি না। পথ খোঁজার চেষ্টা তো হচ্ছে। বাদলবাবুরা প্রসেনিয়াম ভেঙে অন্য রীতির সন্ধান করেছেন। মডার্ন কনটেন্ট, মডার্ন ইমেজারি নিয়ে শরীরকে ব্যবহার করে ওঁরা একটা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। সে চেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। রাস্তায় মাদারির খেলা দেখতে দর্শক সমাগম হয় বটে কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় ভিড় পাতলা হয়ে যায়। মাদারির পেটে তবে চলে কী করে? অন্যদিকে প্রসেনিয়াম নিয়ে নানা পরীক্ষা, নানা

সন্ধানই এখনও বাকি রয়ে গেছে। অনেক নির্দেশক বা নাট্যকারই আছেন যাঁরা প্রসেনিয়ামের স্পেসের ব্যবহার, রঙ ও রেখার তাৎপর্য ইত্যাদি আদৌ জানেন না।

একজন চিত্রকর অসংখ্য ছবি এঁকে চলে। কেন? ছবি আঁকতে-আঁকতে হয়ত একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। সে তখন ওই সমস্যাটিকেই ধাওয়া করতে থাকে। হয়ত কোনও একটি রেখাই তাকে ভাবিয়ে তুলল। অথবা Juxtapositions of Colour এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করল যেটাকে নিয়ে ওই ছবিতে আর কিছুই করা যাচ্ছে না। সে তখন নতুন ছবিতে হাত লাগাল। এইভাবে একটি সমস্যার সমাধানের সূত্র ধরেই নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে। এই সমাধানের প্রচেষ্টা থেকেই অনেক ক্যানভাস জমে ওঠে। কোনটাই ফ্যালনা নয় আবার মহত্তমও নয়। একজন নাট্যশিল্পী অবিরত কাজ করে গেলেন কিনা, তাঁর লক্ষ্য আছে কি না, কী ধরনের নাটক তিনি করলেন, অভিনয়ের মান কীভাবে বজায় রাখছেন এবং সাংগঠনিক দিকটা কীভাবে পরিচালনা করেন—এই সমস্তটাই আমার বিচার্য। নিজেকে পরিচালনা করার জন্যও একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার। চারপাশের ঘটনাবলি থেকে কি কি শুধু অভিনয়টাই শেখার? জীবন-দর্শনকেও গড়ে নিতে হবে। আমার নিজের কাজটা হল সাব-ক্রিয়েটিভ জব। ক্রিয়েটিভ কাউকে না পেলে আমার কাজেরও কোনও মানে থাকে না।

সত্যি বলতে কী, আনন্দ পাওয়ার মতো সেটের কাজ জীবনে খুব কম করেছি। অনেক নির্দেশকদের ঠিক মতো কনভে করতে পারিনি, নানা ক্ষেত্রে আমাকেই ইন্টারফেয়ার করতে হয়েছে। দায়-দায়িত্ব আমার ওপরেই বর্তেছে। ভাবনার বৈচিত্রে যে দুজন একসময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা হলেন শম্ভু মিত্র ও শ্যামানন্দ জালান। শম্ভু মিত্র তো কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন আর শ্যামানন্দ জালানের কাছে আমি আর নতুন কিছু আশা করি না। অন্যান্যরা বেশির ভাগই অন্ধের মতো আমার উপরেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। 'বাঃ, চমৎকার, খালেদদা ছাড়া এরকম হয় না'—ইত্যাদিই শুনি, আমার কাজের প্রকৃত একটা মূল্যায়ন আর হয় না। একটা চ্যালেঞ্জ সিচুয়েশন পেতে চাই। দুর্ভাগ্যবশত তা পাই না।

গঙ্গাদাকে (গঙ্গাপদ বসু) একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম: 'নাটকে আমি অশিক্ষিত। উনি বললেন: সেটাই তোমার অ্যাডভানটেজ। তোমার কোনও ট্রাডিশন নেই বলে তুমি সহজেই ট্র্যাডিশন ভাঙতে পার।' সত্যিই, গুরু-পরম্পরা রক্ষার কোনও দায় আমার নেই। আমি করতে-করতে শিখি আর শিখতে-শিখতে কাজ করি। □